বুধবার, ২৭ ভাদ্র, ১৪২৪
বর্ষ : ৬, সংখ্যা : ৪২

রাজনাথের আশা, কাশ্মীর সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে

উপত্যকায় সফরের পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং ইতিবাচক মতপ্রকাশ করেছেন। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান দ্রুত হবে বলেই তাঁর আশা। ভারতবাসীও কাশ্মীর সমস্যার দ্রুত ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রতীক্ষায়।

উপত্যকা সফররত রাজনাথ বলেন, গত এক বছরে বারবার রক্তাক্ত হচ্ছে উপত্যকা। প্রশাসনের চেষ্টায় আপাতত কিছুটা পরিস্থিতি বদল হয়েছে। তবে এখনও অল্পবয়সি কিশোর-তরুণদের মগজ ধোলাইয়ের চেষ্টা করছে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি। এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এই সমস্ত অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে আরও বেশি সহানুভূতিশীল হতে হবে জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশ প্রশাসন ও সেনাদের। কারও গায়ে অপরাধীর তকমা সেঁটে দেওয়া যাবে না বলে সাফ জানান তিনি। প্রয়োজন হলে কারও বয়স যদি ১৮ বছরের কম হয়, অপরাধের গুরুত্ব বিচার করে তার বিচার হবে জুভেনাইল আদালতে।

জম্মু-কাশ্মীরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজনাথ বলেন, কাশ্মীর সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধান করতে গেলে পাঁচটি পন্থার ওপর নির্ভর করছে। রাজনাথের মতে এগুলি হল- সমবেদনা, সহাবস্থান, দৃঢ়তা, যোগাযোগ এবং অবস্থানগত সুবিধা। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের পরে রাজনাথ জম্মু-কাশ্মীরের উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক এবং সিআরপিএফ জওয়ানদের সঙ্গেও বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে তিনি বলেন, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে গেলে খোলা মনে আলোচনা করতে হবে। আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ করে সমস্যার সমাধান করা যায় না। খোলা মনে মতের আদান-প্রদান করলে তবেই সমস্যার সমাধান হবে।

রাজনাথ সিং যখন সাংবাদিক এবং পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের পথ বাতলাচ্ছেন, তখনই উপত্যকায় দুই জঙ্গিকে খতম করল সেনা। প্রেফতার করা হয়েছে তাদের শাগরেদ আরিফ সোফিকে। একে-৪৭, ইনসাস রাইফেল সহ প্রচুর অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। মৃত দুই জঙ্গিরও পরিচয় জানিয়েছে সেনাবাহিনী। এদের নাম দাউদ আহমেদ আলি এবং শইয়ার আহমেদ ওয়ানি। এই দুই জঙ্গি হিজবুল মুজাহিদিনের সদস্য। জম্মু-কাশ্মীরের কুলগামে এরা লুকিয়ে ছিল বলে বিশেষ সূত্রে খবর পায় সেনা। তারপরেই শুরু হয় চিরুনি তল্লাশি। ভোর ৩টে নাগাদ তল্লাশি অভিযানে নামে সেনাবাহিনী। সেনাকে এগিয়ে আসতে দেখেই এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে জঙ্গিরা। জওয়ানরাও পাল্টা জবাব দেন। তাতেই মৃত্যু হয় দুই জঙ্গির। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপত্যকা সফর চলাকালীন এই দুই জঙ্গিকে নিকেশ করা নিজেদের বড় সাফল্য বলে মনে করছে সেনা ও পুলিশ প্রশাসন।

অমৃত কথা

ঠাকুর ব্রাহ্মভক্তদের, '**তুমি সর্বস্ব আমার**' এই গানটি গাইতে বলিতেছেন। তুমি সর্বস্ব আমার(হে নাথ প্রাণাধার সারাৎসার। নাহি তোম বিনে , কেহ ত্রিভুবনে, আপনার বলিবার।। ঠাকুর গাহিতেছেন,– যশোদা নাচাতো গো মা নীলমণি। সেরূপ লুকালে কোথা কঙ্গালবদনী।।

(একবার নাচ গো শ্যামা) (অসি ফেলে বাঁশী ল'য়ে)
(মুক্তমালা ফেলে বনমালা লয়ে) (তোর শিব বলরাম হোক)
(তেমনি তেমনি তেমনি করে নাচ গো শ্যামা)
(যেরূপে ব্রজমাঝে নেচেছিলি)
(একবার বাজা গো মা, তোর মোহন বেণু)
(যে বেণা রবে গোপীর মন ভুলিত)
(যে বেণুরবে ধেনু ফিরাতিস্)
(যে বেণুরবে যমুনা উজান বয়)
গগনে বেলা বাড়িত, রাণীর মন ব্যাকুল হতো,
বলে ধর ধর ধর, ধর রে গোপাল, ক্ষীর সর নবনী;
এলায়ে চাঁচর কেশ রাণী বেঁধে দিত বেণী।

দিনপঞ্জিকা

২৭ ভাদ্র, ভাঃ ২২ ভাদ্র, **১৩ সেপ্টেম্বর**, ২৭ ভাদ্, সংবৎ ৮ আশ্বিন বদি, ২১ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৬, সূর্য্যস্তি ঘ ৫।৪২। **বুধবার**, অষ্টমী রাত্রি ঘ ১১।২৩ মিঃ। রোহিণীনক্ষত্র দিবা ঘ ৮।১১মিঃ। ব্রজযোগ দিবা ঘ ৯।৩৪মিঃ। বালবকরণ, দিবা ঘ ১২।৫৫ গতে কৌলবকরণ, রাত্রি ঘ ১১।২৩ গতে তৈতিলকরণ। **জন্মে**– বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ঘ ৮।১১ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ঘ ৭।২১ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। **মৃতে**–দোষ নাই। **কালবেলাদি**ঘ ৮।৩০ গতে ১০।২মধ্যে ও ১১।৩৪ গতে ১।৬ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ২।৩০ গতে ৩।৫৮ মধ্যে। **যাত্রা**–শুভ উত্তরে দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ঘ ৮।১১ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ঘ ৭।৪৭ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ, রাত্রি ঘ ১১।২৩ গতে যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**–(অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অবৃদ্ধ্যাহ্ন)। নামকরণ দেবতাগঠন বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ কর্মপিউটারনির্ম্মাণ ও চালন বাহনক্রয়বিক্রয়, দিবা ঘ ৮।১১ মধ্যে ধান্যরোপণ, দিবা ঘ ৮।১১ গতে ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন গোবিক্রয়াদি। **(অতিরিক্ত বিবাহ–সন্ধ্যা ঘ ৫।৪২ গতে রাত্রি ঘ ৯।৪ মধ্যে কুম্ভমীন ও মেষলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ)। বিবিধ**– অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ঘ ১১।২৩ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। **জিতাষ্টমী ব্রত। প্রদোষে** সন্ধ্যা ঘ ৫।৪২ গতে রাত্রি ঘ ৭।১৮ মধ্যে **শ্রীশ্রীজীমূতবাহন পূজা। জিতিয়া উৎসব (বিহার)। শ্রীশ্রী মা মাতঙ্গীদেবীর আবিভর্াব। হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠা দিবস। বিপ্লবী যতীন দাসের মৃত্যুদিবস। কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের প্রয়াণ দিবস। অমৃতযোগ**– দিবা ঘ ৭।২ মধ্যে ও ৯।৩১ গতে ১১।১০ মধ্যে ও ৩।১৮ গতে ৪।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।৩৩ গতে ৮।৫৩ মধ্যে ও ১।৩১ গতে ৫।২৬ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**– দিবা ঘ ১।৩৯ গতে ৩।১৮ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৮।৫৩ গতে ১০।২৫ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৭ ভাদ্র, ভাঃ ২২ ভাদ্র, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২৭ ভাদ্, ২১ জেলহজ্জ উঃ ৫। ২৬, অঃ ৫। ৪২ বুধবার, অষ্টমী রাঃ ঘঃ ১১।২৩।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

ঈশ্বরচন্দ্র ও বিধবা বিবাহ

তপন মুখোপাধ্যায়
শেষ পর্ব

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিদ্রুপ করে লিখলেন, " কথার অভাব নেই বদন ভাঙারে। যত আসে তত বলে, কে দুষিবে কারে।। সাহস কোথায় বল, প্রতিজ্ঞা কোথায়? কিছুই না হতে পারে মুখের কথায়।। মিছামিছি অনুষ্ঠানে, মিছে করি ত্বরা। মুখে বলা বলা নয়, কাজে করা করা।" 'এঁড়ে বাছুর' ঈশ্বরচন্দ্র মাকবাবার পাত্র নন। তিনি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে এগিয়ে এলেন রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। বর্ধমানের পলাশডাঙা গ্রামের ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ছয় বছরে বিধবা হওয়া কন্যার সাথে শ্রীশচন্দ্রের বিবাহ হল ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর। বিদ্যাসাগরের স্বপ্ন সফল হল। তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দশ হাজার টাকা খরচ করে বিবাহ দিলেন ১২ নং সুখিয়া স্ট্রিটে বন্ধুবর রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। যাতে কোনওকার গোলমাল না হয় তার জন্য সরকার থেকে পুলিশ মোতায়েন করা হয় বাড়ির চারপাশে। পরের দিন ঠনঠনিয়ে পানিহাটির মধুসূদন ঘোষের সঙ্গে বারো বছরের বিধবা কন্যা থাকমণির বিয়ে হয়। পরের বছর ফেব্রুয়ারি মাসে রাজনারায়ণ বসুর দু'ভাই বিধবা বিবাহ করেন। এমনি করে ৬০টি বিধবা বিয়ে হয়ে গেল। এই ৬০টি বিয়েতে বিদ্যাসাগরের খরচ হল বিরাশি হাজার টাকা। তাঁর জমানো টাকা সব শেষ হয়ে গেলেও তিনি দমলেন না। কলকাতার অনেক ধনী ব্যক্তি তাঁকে এ বিষয়ে অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেও অনেকেই কথা রাখেননি। কিন্তু তাতে বিদ্যাসাগরের কী আসে যায়, ধার করেও তিনি বিধবা বিবাহ দিতে লাগলেন। পরের ঘরের অনেক ছেলের সাথে বিধবা মেয়েদের বিয়ে তো হল। কিন্তু নিজের ঘরে তো এখনও বিধবা বিবাহ হল না। হঠাৎ করেই সে সুযোগ এসে গেল। খানাকুলের শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা স্ত্রী সারদাদেবী বিদ্যাসাগরের ভাই শম্ভুচন্দ্রকে ধরলেন তাঁর ষোলো বছরের বিধবা মেয়ে ভবসুন্দরীর পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করে দিতে। ঈশ্বরপুত্র নারায়ণচন্দ্র ভবসুন্দরীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিবাহ করতে চাইলেন। শম্ভুচন্দ্র দাদাকে সব কিছু জানালেন। দাদা ঈশ্বরচন্দ্র খুব খুশি হলেন। ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ২৭ শ্রাবণ ঈশ্বরচন্দ্র নিজে উপস্থিত থেকে পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে ভবসুন্দরীর বিবাহ দিলেন। এই বিবাহে বিদ্যাসাগরের কোনো আত্মীয়স্বজন যোগদান করেননি। কিন্তু তাতে বিদ্যাসাগরের কিছু যায় আসে না। তিনি ভাই শম্ভুচন্দ্রকে জানান, 'আমি বিধবা-বিবাহের প্রবর্তক। আমরা উদ্যোগ করিয়া

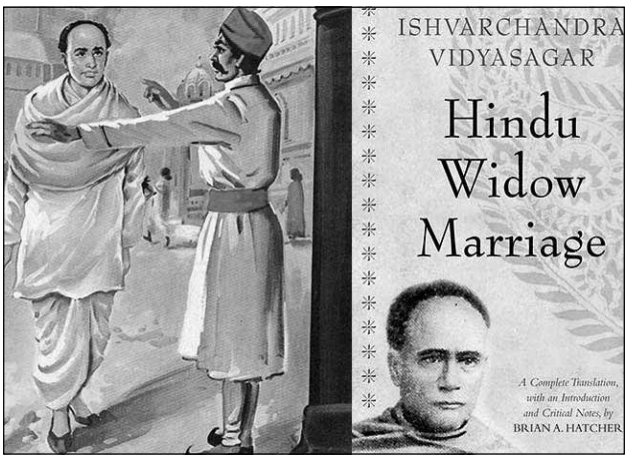

অনেকের বিধবাবিবাহ দিয়াছি। এমনস্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না।... বিধবা বিবাহ দেওয়া আমার জীবনের সর্বপ্রধান কার্য। এ জন্মে ইহা অপেক্ষা আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ ও সামান্য কথা।' কিন্তু এই বিধবা বিবাহ ব্যাপারে ভুল বোঝাবুঝির জন্যই ঈশ্বরচন্দ্র চিরতরে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় গ্রাম বীরসিংহ ত্যাগ করেন। মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক শিক্ষক মনোমোহিনীদেবী নামী এক বিধবাকে বিবাহ করতে চান। এই মুচিরামবাবু ছিলেন ক্ষীরপাই গ্রামের সম্ভ্রান্ত হালদার পরিবারের ভিক্ষাপুত্র। ওই পরিবারের লোকজন কেঁদে কেটে বিদ্যাসাগরকে এই বিবাহে না থাকতে এবং ওই গ্রামে বিবাহ যাতে না হয় তা দেখতে অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর দয়াপরবশ হয়ে তাতে সম্মত হন। মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বিদ্যাসাগরের ভাই দীনবন্ধু'র শরণ নেন। দীনবন্ধু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এই বিবাহ দেন। বিদ্যাসাগর এতে আঘাত পান। তিনি ভাইকে বলেন, 'তুমি ভিন্ন গ্রামে এদের বিয়ে দিতে পারতে, আমি হালদারবাবুদের কাছে মিথ্যেবাদী হয়ে গেলাম। ঠিক আছে, আজ থেকে আমি এই গ্রামের সংশ্রব ত্যাগ করলাম।' যে বিধবাবিবাহের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র সর্বস্বান্ত হতেও কুণ্ঠিত হননি, সেই বিধবাবিবাহের জন্যই তিনি তাঁর প্রিয় গ্রাম বীরসিংহ ত্যাগ করেন। বাকি জীবনে আর একবারও গ্রামে ফিরে আসেননি। বিদ্যাসাগরের জীবনে এটাই বোধহয় সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি।

'অহিংসা পরমো ধর্মঃ'

গদাধর রানা

● আমরা কমবেশি শাস্ত্রাধ্যয়ন ক'রে অবহিত হ'তে পেরেছি–ইষ্ট, আরোধ্য ও প্রিয় পরমের সাথে সাধকের নিত্যযোগের অনুষঙ্গরূপে শাস্ত্রে বিভিন্নভাবে 'যোগাঙ্গ'-এর কথা বলা হয়েছে। যোগদর্শনে তা 'অষ্টাঙ্গযোগ'–নামে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। সেখানে বলা হয়েছে এইরকম যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আট প্রকারের নাম যোগাঙ্গ।

● ওই অষ্টাঙ্গ যোগের সবার প্রথমটি অর্থাৎ 'যম' সম্বন্ধে বলা হয়েছে–'অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্যপরিগ্রহা যমাঃ'–অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ–এই পাঁচ প্রকার কার্য্যের নাম যম। আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে ধর্মপালন বা ধর্মাচরণের অন্যতম অপিরহার্যকৃত্য 'অহিংসা' সম্বন্ধেই আমাদের আলোচনাকে কেন্দ্রায়িত করব।

● বলাই বাহুল্য, যা হিংসা নয় তাই অহিংসা। হিংসা কী? হিংসা পদটির ধাতুগত অর্থ ক্ষতি, উৎপাত, অপকার, অত্যাচার, পরানিষ্টসাধন প্রবৃত্তি, দ্বেষ, ঈর্ষা, বধ, হত্যা, হনন ইত্যাদি। এক কথায়, কোনও প্রকার পরপীড়নকেই হিংসা বলা যায়। তাই, শারীরিক, মানসিক ও বাচিক-এই তিনভাবে অপরের ক্লেশ উৎপাদনই হিংসা। আর এর বিপরীতধর্মী আচরণই যে অহিংসা, তা বলাই বাহুল্য। কায়মনোবাক্যে পরপীড়াবর্জন, প্রাণীপীড়ানিবৃত্তি, অন্যের অনিষ্ট না করা, অন্যের অনিষ্টে অপ্রবৃত্তিই হচ্ছে অহিংসা।

● অহিংসাকে পরম ধর্ম বলা হয়। জনৈক মহাজন বলেছিলেন– অন্যকে বাঁচিয়ে নিজে বাঁচার নামই ধর্ম–বলতে কি, এ মতামতটি প্রায় একজন মহাজনেরই বাণীসম্ভূত বলব কেন–এটি তো চির সত্য সনাতন ধর্মী–এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে বলা যায়। বলতে কি, অন্যকে বাঁচাতে গেলে তা যে অহিংসা ছাড়া কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়– তা সহজেই বোঝা যায়। অহিংসার প্রশ্ন সেখানেই ওঠে, যেখানে হিংসা সংঘটিতহয়। তাই, হিংসার নিরোধ বা প্রতিকারের জন্য অহিংসার আচরণ নিতান্তই যুক্তিসংগত বা অপেক্ষিত।

● বলাই বাহুল্য, অহিংসা-ই পরম ধর্ম, হিংসা তো পরম ধর্ম নয়। হিংসাকে অটুট রাখলে তো অহিংসার প্রতিষ্ঠা হয় না। অহিংসার প্রতিষ্ঠার জন্য হিংসাকে সরাসরি হিংসা করতে হবে, যেমনটি সুস্থতা মানতে গেলে অসুস্থতাকে বধ বা নিকেশ করতে হবে। আবার এমনটিও বলা যায়, সক্রিয়তা জাগাতে গেলে নিষ্ক্রিয়তাকে মারতে হবে। তাই, অহিংসার সঙ্গে সঙ্গে আছে হিংসাকে হিংসা করা। হিংসাকে অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ রেখে অহিংসার প্রতিষ্ঠা হয় না। বলাই বাহুল্য, হিংসার প্রতি অহিংস হওয়া মানে হিংসাকে প্রশ্রয় দিয়ে পুষ্ট করা। এমনও ব্যাখ্যা হতে পারে–হিংসকের হিংসার প্রতি যদি আমরা অহিংস হই তবে সেটিই হবে অহিংসবিরোধী অর্থাৎ হিংসাপোষণী আচরণ।

● সত্তার প্রতি অহিংস হওয়া মানেই হল সত্তার প্রতিকূল যা, তাকে হিংসা করা। ধরা যাক–যে স্বাস্থ্য চায়, রোগকে তার হিংসা করতেই হবে।

● কোনো মানুষই চায় না অন্যে তাকে হিংসা করুক। এতেই বোঝা যায় যে হিংসার প্রতি মাননীয় সত্তার কোনো আগ্রহ নাই, তবু যে মানুষ হিংসা করে তার দুর্বলতা এবং আত্মকেন্দ্রিক প্রবৃত্তি মুখর আসক্তি-ই মূলত দায়ী। এগুলিকে যত জয় করা যাবে, ততই অহিংসার জয়জয়কার হবে।

● আমরা বারবারই এই সারটুকু বুঝতে চাই বা বলতে চাই–হিংসাকে হিংসা করতে হবে অহিংসার জন্য, অধর্মকে অবলুপ্ত করতে হবে ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য, ব্যধিকে বিধ্বস্ত করতে হবে স্বাস্থ্যের জন্য, মৃত্যুকে মারতে হবে জীবনের জন্য।

● মোট কথা, হিংসা হল তাই-ই যা জীবনের স্থিতি ও প্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এই প্রতিবন্ধকের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক রচনা করাই অহিংসার কাজ। অধর্মের প্রতিবিধান না করলে ধার্মিক হওয়া যায় না, অপ্রেমকে নিরস্ত না করলে কখনই প্রেমিক হওয়া যায় না। বস্তুতঃ, সত্তা-সংরক্ষণই আমাদের কাম্য; তাই অহিংসাকে তেমন ক'রে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে সত্তা বজায় থাকে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে শুভবুদ্ধি প্রসূত, কৌশলী, সংযত, কঠোর প্রতিরোধ রচনা না করলে অহিংসার সাধনা সফল হয় না। বলাই বাহুল্য–হিংসায় যে অহিংস, পাকেপ্রকারে সে শুদ্ধাতিশুদ্ধ সত্তাকেই হিংসা করে বলে বলা হবে।

● আমরা এমন এক সিদ্ধান্তে আসতে পারি – পরমধর্মরূপ অহিংসার আচরণ, হিংসার নিরোধ ও নিরাকরণের মাধ্যমেই সম্ভব। আবার একথাও সত্য–একাধিক মহাজনেরাই বলে গেছেন–পাপীকে ঘৃণা বা হিংসা নয়, পাপকেই হিংসা বা ঘৃণা করতে হবে--তারই ফলে, পাপীকে পাপমুক্ত ক'রে তোমার চেষ্টা সার্থকতা পাবে।

● মোট কথা, অহিংসার প্রতিষ্ঠাকালে হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হ'তেই হবে। যেমন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মহামতি যীশুখ্রীষ্ট নিয়তই প্রতিবাদমুখর ছিলেন। মন্দিরে গিয়ে তিনি দেখলেন–মন্দিরের প্রাঙ্গনেতেই ব্যবসাদারেরা পসরা সাজিয়ে রীতিমতো সেনা বসিয়ে ফেলেছে। সেখানে তিনি যেন তেন প্রকারে প্রবল পরাক্রমে সবাইকে সরিয়ে দিলেন। আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জীবনেও দেখেছি–জগাই-মাধাই এর মত অবস্থায় প্রভু নিত্যানন্দের শরীরে আঘাতও তৎজন্য রক্তপাতের ঘটনায় চৈতন্যদেব প্রাণে প্রাণে শতভাবে প্রেমিক পুরুষ হয়েও নিরোধ বা প্রতিবাদের জন্য ভয়ংকর রোষ প্রকাশ করেছিলেন--এসব ইতিহাস আমাদেরকে জানিয়ে দেয়।

আবার, সুকৌশলে শক্তিসংহত না করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলে অনেক সময় বিঘ্নবিপদও আসতে পারে। যুগে যুগে পুরুষোত্তমরা এই ধরাধামে এসে অশুভ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে শান্ত প্রতিবাদ জানিয়েই এখানে স্বর্গরচনা ও স্বর্গের শান্তি বিতরণ করে গেছেন।

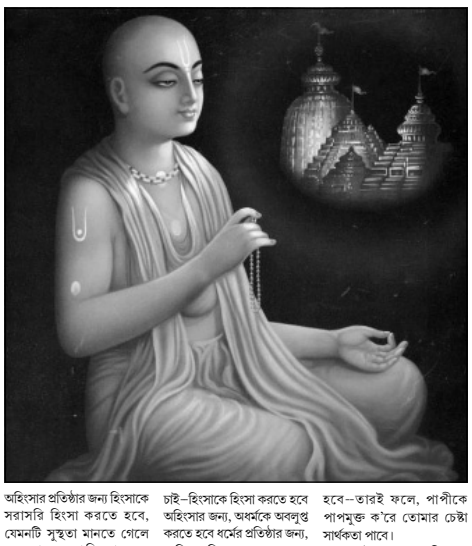

সম্পাদক সমীপেষু

গঙ্গাসাগরে ডুবেছিল একটি জাহাজ

হিমশৈলের সাথে আঘাত লেগে টাইটানিক জাহাজ ডুবে গিয়েছিল ১৯১২ সালে। সেই জাহাজের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করা হয়েছিল ১সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫। এই গল্পের সাথে আমাদের পরিচয় হয়ে গেছে অনেক দিন আগেই। আমরা ছোটবেলায় একটি বই পেয়েছিলাম যা আমাদের স্কুলের বই হিসাবে দেওয়া হয়েছিল। সেই বই পড়েই জানতে পারি, হিমশৈলের সাথে আঘাত লাগার দরুণ টাইটানিক জাহাজের তলায় যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল সেই ক্ষতের জন্যই টাইটানিক ডুবে গিয়েছিল। এই গল্পকে ভিত্তি করেই টাইটানিক নামে একটি ইংরাজি ছবি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা সেটাও দেখেছি এবং এই টাইটানিক ছবি ১১ টি অস্কার পুরস্কারও পেয়েছে। আমরা জানতে সর্বদাই চেষ্টা করি। আর একটা অজানা গল্প যখন জানতে পারি তখন প্রত্যেকেরই ভালো লাগে। এখানে জাহাজটি ডুবেছিল গঙ্গাসাগরের একেবারে কাছে এসে। সবতীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কচুবেরিয়া পার করে যখন গঙ্গাসাগর দর্শন করতে যাই তখন গঙ্গা ও সাগরের মিলনস্থলটাকে দেখি। সেই মিলনস্থানেই এই জাহাজটা ডুবে গিয়েছিল। টাইটানিক জাহাজ ডোবার প্রায় ৫৯ বছর আগে, ১৮৫৩ সালে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। দেখতে দেখতে ১৬৪ বছর পার হয়ে গেল এমন একটা ঘটনার। টাইটানিক যেমন ছিল ১৯১২ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজটির নাম, এখানে যে জাহাজটি ১৮৫৩ সালে ডুবে গিয়েছিল সেই জাহাজটির নাম 'গুড উইল'। সংসারেতে প্রতিটি দিনই কত ঘটনা ঘটে যায়। যার সবটুকু মনে রাখা যায় না, ভারতীয় সিনেমাতেও জাহাজকে কেন্দ্র করে 'সম্রাট' ছবিটি বানানো করা হয়েছিল। ধর্মেন্দ্র, জীতেন্দ্র, হেমা ও নিতু সিং এই সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন। এখানেও গানেতে বলা ছিল, 'পাঞ্জা ছক্কা সাত্তা।'

প্রবীর মিত্র
হাওড়া ৪

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।.....সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড,
স্কিম-এলভি,
কলকাতা-৭০০০১৪

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড,
স্কিম-এলভি,
কলকাতা-৭০০০১৪

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক